অরভিল রাইট ও উইলবার রাইট

[১৮৭১—১৯৪৮] [১৮৬৭—১৯১২]

উইলবারের জন্ম ১৮৬৭ সালে আমেরিকার ইণ্ডয়ানা প্রদেশে। অরভিলের জন্ম ১৮৭১ সালে। ছেলেবেলা থেকেই দুই ভাই-এর মধ্যে ছিল যেমনই কল্পনাশক্তি তেমনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি।

পড়াশুনা শেষ করে দুই ভাই হাতে কলমে কাজ করবার জন্য ছোট কারখানা তৈরি করলেন, প্রথমে তাঁরা কিছুদিন বাজারে প্রচলিত ছাপার যন্ত্র নিয়ে কাজ শুরু করলেন যাতে তার ব্যবহার আরো সহজ সরল ও উন্নত হয়। এর পর বাইসাইকেলের উন্নতির জন্য সচেষ্ট হলেন। দুটি ক্ষেত্রেই তাঁরা অনেকাংশে সফল হয়েছিলেন। এবং তাঁদের প্রবর্তিত আধুনিক যন্ত্র ব্যাপক জনপ্রিয় হয়েছিল।

তবে যে উড়োজাহাজ আবিষ্কারের জন্য দুই ভাই-এর খ্যাতি, তার চিন্তাভাবনা শুরু হয় ১৮৯৬ সাল থেকে।

একজন জার্মান ইঞ্জিনিয়ার অটো লিলিয়েনথাল কয়েক বছর যাবৎ উড়ন্ত যান নিয়ে গবেষণা করছিলেন। লিলিয়েনথালের তৈরি যান আকাশে উড়লেও তাতে নানা ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হত। ১৮৯৬ সালে লিলিয়েনথালের আকস্মিক মৃত্যুতে গবেষণার কাজ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়।

লিলিয়েনথালের তৈরি উড়ন্ত যানের (Gliding Machine) নক্সা ভালভাবে পরীক্ষা করে রাইট ভাইরা দেখলেন যেমন তা অসম্পূর্ণ অন্যদিকে তেমনি নানা ভুলত্রুটিতে ভরা।

শুরু হল তাঁদের প্রচেষ্টা। এ যাবৎকাল উড়ন্ত যান সম্বন্ধে যত কাজকর্ম হয়েছে তার সমস্ত বিবরণ সংগ্রহ করলেন দুই ভাই। প্রতিটি নক্সা বিবরণ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে তাঁরা বুঝতে পারলেন শুধুমাত্র বাতাসের গতিবেগে একে বেশিদূর চালনা করা যাবে না, প্রয়োজন শক্তিচালিত ইঞ্জিনের যা একমাত্র পারবে উড়ন্ত যানকে গতি দিতে। কিন্তু কেমন হবে সেই ইঞ্জিন, তার প্রকৃত কিছুতেই নির্ধারণ করতে পারেন না। পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতে থাকে। প্রতিবারই সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পরিণত হয়। এক এক সময় হতাশায় ভেঙে পড়েন দুজনে। সব চেষ্টা বুঝি ব্যর্থ হয়ে যাবে। সাময়িক হতাশাকে কাটিয়ে উঠতে সময় লাগে না। আবার নতুন উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়েন দুই ভাই। যে কোন মূল্যেই হোক সাফল্য তাঁদের অর্জন করতেই হবে।

অল্প কিছুদিন পর তাঁরা বুঝতে পারলেন এই ভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রকৃত সাফল্য অর্জন করা সম্ভব নয়। প্রয়োজন আরো জ্ঞানের। পরিপূর্ণ জ্ঞান না হলে সাফল্য অনিশ্চিত।

ইতিমধ্যে এই বিষয়ে যা কিছু লেখা হয়েছে সমস্তই তাঁরা সংগ্রহ করলেন। নিরলস অধ্যাবসায় নিয়ে শুরু হল তাঁদের অধ্যয়ন।

শুধু যে পূর্বসূরীদের প্রচেষ্টা, তাদের সাফল্য ব্যর্থতার ইতিবৃত্ত অধ্যায়ন করলেন তাই নয়, তাঁরা বিজ্ঞানীদের বিভিন্ন রচনা থেকে জানলেন বাতাসের গতিবেগ, নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের মধ্যে তার চাপ, ভারসাম্য নির্ণয়ের পদ্ধতি। তাছাড়া কিভাবে এতদিন বিভিন্ন উড়ন্ত যান নির্মাণ করা হত তার নির্মাণ কৌশল, আরো অসংখ্য বিষয়।

এল গ্লাইডার বা ছোট ছোট খেলনার আকৃতির যন্ত্র। যা নানান প্রক্রিয়ায় বাতাসে ভাসিয়ে দেওয়া হত। কিন্তু তাতে তো মানুষের উড়া সম্ভব হত না।

দুই ভাই ছোট একটা কারখানা তৈরি করলেন। দীর্ঘ এক বছরে প্রচেষ্টায় সেই কারখানায় তৈরি হল এক বিশাল গ্লাইডার বা উড়ন্ত যান। এতদিন যে ধরনের গ্লাইডার তৈরি হত এই গ্লাইডার তার চেয়ে একেবারে স্বতন্ত্র। এই গ্লাইডার বাতাসে ভারসাম্য রেখে সহজেই উড়ে যেতে পারে।

গ্লাইডার-এর সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে রাইট ভাইয়েরা তৈরি করলেন দুই পাখাবিশিষ্ট ছোট বিমান। এই বিমানের সামনে ও পেছনের ভারসাম্য রক্ষার জন্য একটা ছোট যন্ত্র জুড়ে দেওয়া হল। এর নাম এলিভেটর। এই এলিভেটরের সাহায্যেই পাইলট কোন বিমানকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।

সমস্ত নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার পর শহরে থেকে দূরে এক নির্জনে এই দুই পাখাওলা বিমানকে শূন্যে ভাসিয়ে দেওয়া হল। বেশ কয়েকবার বিমানকে আকাশে ওড়বার পর দুই ভাই বুঝতে পারলেন এখনো তাঁদের উদ্ভাবিত বিমানের কলাকৌশলের কিছু পরিবর্তন করার প্রয়োজন হলেও তাঁরা সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌছেছেন।

আবার শুরু হল তাঁদের কর্মযজ্ঞ। এইবার লক্ষ্য কিভাবে গ্লাইডারকে শক্তিচালিত করা যায়। বিভিন্ন ধরনের ইঞ্জিন নিয়ে পরীক্ষা করবার পর দেখা গেল একমাত্র পেট্রল চালিত ছোট ইঞ্জিনই বিমান চালনার ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে। এবং প্রতি তিন পাউন্ড ওজনের জন্য এক অশ্বশক্তি সম্পন্ন ইঞ্জিনের আবশ্যক।

বাজারে যে সমস্ত ইঞ্জিন পাওয়া যায় তার প্রতিটিই গাড়ির ব্যবহারের জন্য, বিমানে ব্যবহারের অনুপযুক্ত। দুই ভাই ইঞ্জিন তৈরির কাজে হাত দিলেন। কয়েক মাসের চেষ্টায় তৈরি হল বিমানে ব্যবহারের উপযুক্ত ইঞ্জিন।

অবশেষে এল সেই দিন, ১৭ই ডিসেম্বর ১৯০৩। উইলবার ও অরভিল তাঁদের তৈরি বিমান নিয়ে এলেন Kitty Hawk শহরের প্রান্তে। মানুষ বিমানে চেপে মহাশূন্যে পাখির মত ভেসে বেড়াবে। এই সংবাদ আগেই শহরময় প্রচারিত হয়েছিল। কিন্তু কেউই একথা বিশ্বাস করল না। উপরন্তু দিনটা ছিল কনকনে ঠাণ্ডার দিন।

প্রথমে দুই ভাই তাঁদের বিমানের সাথে ইঞ্জিন যুক্ত করলেন। সমস্ত যন্ত্রপাতি শেষবারের মত পরীক্ষা করলেন। শেষ পর্যন্ত দুই ভাইই নিশ্চিত হলেন তাঁদের তৈরি প্রথম এরোপ্লেন ওড়বার জন্য

সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত হয়েছে। যদিও সেই সময় এরোপ্লেন (Aeroplene) নাম দেওয়া হয়নি। নাম দেওয়া হয়েছে রাইট ফ্লাইয়ার (Wright Flyer)।

ঠিক হল লটারির মাধ্যমে ঠিক হবে কে প্রথম এরোপ্লেন চালাবে। একটা মুদ্রা নিয়ে টস করা হল। অরভিল জয়ী হলেন। বিজয়গর্বে বিমানের আসনে গিয়ে বসলেন। নিচে দাঁড়িয়ে রইলেন উইলবার। তখন সেখানে উপস্থিত মাত্র পাঁচজন মানুষ। Kitty Hawk-এর মানুষেরা কল্পনাও করতে পারেনি কি যুগান্তকারী ঘটনা ঘটতে চলেছে তাদেরই শহরে।

অল্প অল্প বাতাস বইছিল। অরভিল বিমানের প্রপেলার চালু করলেন। উইলবার বিমানের সঙ্গে বাঁধা দড়িটা খুলে দিলেন। তারপর সমস্ত শক্তি দিয়ে উড়ন্ত যানকে ঠেলতে আরম্ভ করলেন। সামান্য দূর গিয়েই বাতাসের বুক চিরে শূন্যে উড়ে চলল প্রথম বিমান। কিছুদূর গিয়ে একবার পাক খেল। তারপর ধীরে ধীরে মাটিতে নেমে এল।

ঘড়িতে দেখা গেল বারো সেকেণ্ড বাতাসে ভেসেছিল রাইট ভাইদের প্রথম এরোপ্লেন। মাত্র বারো সেকেণ্ড। কিন্তু উপস্থিত পাঁচজন এমনকি রাইট ভাইরাও সেদিন কল্পনা করতে পারেননি, ঐ স্বল্পক্ষণের বিমানযাত্রাই নতুন যুগের সূচনা করল, যে যুগ গতির যুগ, সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে ছোটার যুগ।

নিরাপদে অবতরণ করে অরভিল বিমান থেকে বেরিয়ে এলেন। এইবার উইলবারের পালা। ভাই-এর সাফল্যে উজ্জীবিত হয়ে উইলবার আকাশে ভেসে রইলেন উনষাট সেকেণ্ড। এবং প্রায় ৮২০ ফিট দূরত্ব অতিক্রম করলেন। তারপর ধীরে ধীরে অবতরণ করলেন।

সেই দিন আর আকাশে ওড়া সম্ভব হয়নি। ঝড়ো বাতাসের বেগ বাড়ছিল।

সাফল্যের আনন্দে দুজনেই আত্মহারা। কয়েকদিন কেটে গেল। প্রাথমিক উত্তেজনার রেশটুকু স্তিমিত হয়ে আসতেই নতুন উদ্যমে আবার ঝাঁপিয়ে পড়লেন দুই ভাই। এইবার তৈরি হল আগের চেয়ে বড় আর শক্তিশালী বিমান।

দুই ভাই ঠিক করলেন তাঁদের এই সাফল্যের কথা সমস্ত মানুষকে জানাতে হবে। এতদিন যা ছিল শুধুমাত্র তাঁদের, আজ থেকে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরতে হবে। আমেরিকার প্রায় প্রতিটি সংবাদপত্রকে আমন্ত্রণ জানালেন তাঁদের আকাশে ওড়ার দৃশ্যকে প্রত্যক্ষ করতে।

সেদিন সকাল থেকে ঝোড়ো বাতাস বইছিল। নতুন ইঞ্জিনটাও ঠিকমত কাজ করছিল না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আকাশে ওড়ার পরিকল্পনা বাতিল করতে হল।

এই বিপর্যয়ে সাময়িকভাবে দুই ভাই ভেঙে পড়লেও ধীরে ধীরে মানসিক শক্তি ফিরে পেলেন। আবার নতুন উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

যে ইঞ্জিনে গণ্ডগোল দেখা গিয়েছিল, তা সম্পূর্ণ দূর করা হল। তারপর শুরু হল নিয়মিত আকাশে উড়ান। এবার আর কোন প্রচার নয়, সাংবাদিক সম্মেলন নয়, সকলের অগোচরে একটু একটু করে আকাশে উড়বার সময় বাড়াতে থাকেন দুই ভাই। এক মাইলেরও বেশি দুরত্ব পার হয়ে যান তাঁরা।

বিমানের কাজকর্ম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে করতে ইতিমধ্যে প্রায় নিঃস্ব হয়ে পড়েছিলেন দুই ভাই। কিছুটা নিরুপায় হয়েই সাময়িকভাবে আকাশে ওড়ার পরিকল্পনা বন্ধ রেখে ব্যবসার কাজে মন দিলেন। বাজারে যত ধার-দেনা হয়েছিল একে একে সমস্ত শোধ করলেন। হাতে সামান্য কিছু অর্থ সঞ্চিত হতেই দুই ভাই আবার বিমান তৈরির গবেষণায় মনোনিবেশ করলেন। তাঁদের আশঙ্কা ছিল যদি অন্য কেউ বিমান তৈরি সর্বসমক্ষে আকাশে উড়ে বেড়ায়। কারণ সেই সময় ইউরোপেও কিছু মানুষ উড়ন্ত যান নিয়ে গবেষণা করছিল।

রাইট ভাইরা শুধু সাংবাদিক নয়, বিশিষ্ট কিছু মানুষকেও নিমন্ত্রণ জানালেন তাঁদের আকাশে ওড়বার দৃশ্য প্রত্যক্ষ করবার জন্য। এই বার আর বিফলতা নয়। সকলে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে রাইট ভাইরা কেমন করে একে একে পাখির মত স্বচ্ছন্দে আকাশপথে বিমানে চড়ে উড়ে চলেছে। বাতাসের মত এই সংবাদ শুধু আমেরিকা নয়, ইউরোপেও ছড়িয়ে পড়ে। চতুর্দিক থেকে প্রশংসা আর অভিনন্দনবার্তা আসতে থাকে। তবুও নিজেদের অগ্রগতিতে সন্তুষ্ট হতে পারেন না রাইট ভাইয়েরা। আরো উন্নত ধরনের বিমান তৈরি করবার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু তার জন্যে প্রয়োজন প্রচুর অর্থের। এগিয়ে আসে এক সিণ্ডিকেট। তারাই প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদানের সব ভার গ্রহণ করে।

নতুন সিণ্ডিকেট আমেরিকান গভর্নমেণ্টের সাথে চুক্তিবদ্ধ হল। অরভিল চুক্তির শর্ত অনুসারে আমেরিকায় রয়ে গেলেন, উদ্দেশ্য আরো উন্নত ধরনের বিমান তৈরি করা।

উইলবার ফ্রান্সে গেলেন। সেখানে দেখালেন বিমানে ওড়বার কলাকৌশল। ফ্রান্সের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি প্রতিদিন তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসত।

একদিন আমেরিকায় অরভিল রাইট সামরিক বাহিনীর এক অফিসারকে সাথে নিয়ে যখন বিমানে আকাশপথে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, সেই সময় আকস্মিক ভাবে একটা প্রপেলার ভেঙে প্লেন মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ল। সৌভাগ্যক্রমে গুরুতর আহত অরভিলের প্রাণ রক্ষা হলেও সঙ্গী অফিসার দুর্ঘটনাস্থলেই মারা যান।

কিছুদিনের চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠলেন অরভিল। ততদিনে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ এরোপ্লেন কেনবার জন্য আবেদন জানাতে থাকে।

রাইট ভাইরা বুঝতে পারেন তাঁদের সুদীর্ঘ পরিশ্রম নিষ্ঠা অধ্যবসায় এতদিনে সফল হয়েছে। সমস্ত পৃথিবীর সামনে তাঁরা এনে দিয়েছেন এক নতুন গতি। যে গতির কথা মানুষ কল্পনা করতে পারেনি।

অবশেষে ১৯১২ সালে উইলবার মারা গেলে। অরভিল তারপরেও বহু বছর বেঁচে ছিলেন। আমৃত্যু তিনিও বিমানে উন্নয়ন ও উৎপাদনের কাজে জীবন উৎসর্গ করে গিয়েছেন।